সহজ কথায়

ইসলামী আন্দোলন

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

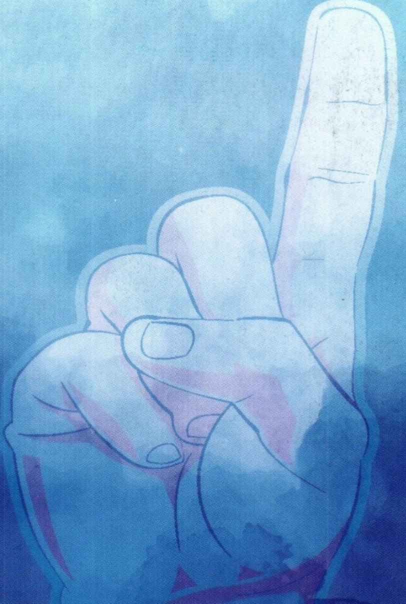

সহজ কথায়

ইসলামী আন্দোলন

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সাবেক এমপি

সহজ কথায় ইসলামী আন্দোলন

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

প্রকাশনায়
আল ইসলাহ প্রকাশনী
মহিশালবাড়ী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ১৯৯৯

ষষ্ঠ প্রকাশ
মে ২০১৮

সপ্তম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০২৪

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৩০.০০ টাকা মাত্র

পরিবেশনায়
আহসান পাবলিকেশন
মগবাজার, কাঁটাবন, বাংলাবাজার
মাওলা প্রকাশনী
১৯৩ ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
ফোন : ৫৮৩১৩১২৭, ০১৮৬৬ ৬৭৯১১০

Sahaj Kathai Islami Andolon By Prof. Mujibur Rahman
Published by Al-Islah Prokasoni, Mohishal Bari, Godagari, Rajshahi, Bangladesh
Fixed Price : TK. 20.00 Only

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহ তায়ালার অশেষ মেহেরবানীতে অল্প সময়ের ব্যবধানেই "সহজ কথায় ইসলামী আন্দোলন" পুস্তিকাটির ইতোমধ্যে চতুর্থ সংস্করণ শেষ হয়ে গেছে। পাঠকদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চম সংস্করণ ছাপানোর কাজে হাত দিতে হল। সহজ কথায় সাধারণ পাঠকদের কাছে ইসলামী আন্দোলনকে পরিচিত করার লক্ষ্য নিয়ে পুস্তিকাটি লেখা হয়েছিল। আলহামদুলিল্লাহ সে লক্ষ্য হাসিল হতে পারছে এমন তথ্য পাঠকদের কাছ থেকে পেয়ে লিখাটি কিছুটা হলেও সার্থক হয়েছে বলে মনে করছি।

অত্যন্ত ব্যস্ত সময়ের মধ্যে এ সংস্করণটি ছাপা হল। তাই ভুল-ত্রুটি থাকা খুবই স্বাভাবিক। আগামীতে পাঠকদের নিকট থেকে কোন সংশোধনী পেলে ধন্যবাদের সাথে তা গৃহীত হবে এবং সংশোধনের চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তার দ্বীনকে সহজ ভাষায় মানুষের কাছে আরো বেশী বেশী পৌছানোর তওফিক দিন। আমীন॥

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সাবেক এমপি

সূচীপত্র

- সকল সৃষ্টিই আল্লাহর ৫
- মানুষ চিন্তা করে পশু-পাখী চিন্তা করে না ৫
- কেন এলাম এ দুনিয়ায় ৬
- এবাদতের প্রকার ভেদ ৭
- ইসলাম একমাত্র জীবন বিধান ৭
- পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ৮
- ইসলাম এর ভিত্তি ৯
- ইসলাম এর মানদণ্ড ১০
- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক ধারণা ১১
- ইসলাম একটি প্রাসাদের মত ১৩
- কুরআন পাঁচ পাতার কিতাব নয় ১৪
- আইন দুই প্রকার ১৪
- নবী রাসূলের কাজ ১৫
- আল্লাহর আইন উপরে থাকবে ১৫
- আল্লাহর আইন সকলের জন্য ১৬
- রাসূল পাঠানোর উদ্দেশ্য ১৭
- রাষ্ট্রশক্তি ছাড়া আইন চালু হয় না ১৮
- জামায়াতবদ্ধ চেষ্টা করা ফরজ ১৮
- জিহাদই মুক্তির পথ ১৯
- মাল দিয়ে সংগ্রাম করা ১৯
- টের পাওয়ার মত খরচ করুন ২০
- দ্বীনী কাজে ভারসাম্য রক্ষা করুন ২০
- সাপ্তাহিকভাবে জামায়াতবদ্ধ কাজ করুন ২১
- দাওয়াতী কাজ ২১
- ইসলামী আন্দোলনে নবী রাসূলগণের উদাহরণ ২২
- ইসলামী আন্দোলনে সাহাবীদের উদাহরণ ২৫
- মহিলা সাহাবীর উদাহরণ ২৭
- আত্মীয়তা বড় নয় আদর্শই বড় ২৮
- ইসলামী আন্দোলনের সৈনিকদের আকীদা ২৯
- শাহাদাতের আকাঙ্খী একটি উদাহরণ ৩১
- সকল কাজ আখেরাতের চেতনায় করুন ৩২

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সহজ কথায় ইসলামী আন্দোলন

সকল সৃষ্টিই আল্লাহর

এ বিশাল আসমান-জমীন এবং যা কিছু আসমান-জমীনের মাঝে আছে তার সব কিছুই আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন। যা কিছু আমরা দেখতে পাই আর যা কিছু আমরা দেখতে পাই না, তার সবই তিনি সৃষ্টি করেছেন। যে চোখ দিয়ে পথ দেখি, যে হাত দিয়ে লিখি এবং যে পা দিয়ে চলি এগুলো তিনি দিয়েছেন। আমাদের সীমিত জ্ঞানের মাধ্যমে যা বুঝতে পারি, আর যা বুঝতে পারি না তার সব কিছুই তিনি সৃষ্টি করেছেন। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা, গাছ-পালা, নদী-নালা, কীট-পতঙ্গ, জন্তু-জানোয়ার, পাখ-পাখালী, জীবন আছে অথবা জীবন নেই এমন সকল কিছুই তিনি সৃষ্টি করেছেন। এসব শুধু সৃষ্টি করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। এদের লালন পালন এবং এদের চলার জন্য বিধি-বিধানও তিনি দিয়ে দিয়েছেন। এ জন্যই সকল প্রশংসার পাত্র তিনি এবং সমস্ত জগতের রব। এ জন্যই আসমান-জমিনের সকল স্থানে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আল কোরআনের হৃদয়গ্রাহী আয়াত ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সমস্ত জগতের মালিক।"

رَبُّنَا الَّذِيْ أَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰى

আমাদের রব-"যিনি সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে পথ দিখিয়েছেন।" (ত্বোয়া-হা-৫০)

মানুষ চিন্তা করে পশু-পাখী চিন্তা করে না

আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সকল কিছু আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাহলে চিন্তা করতে হবে মানুষকে কার জন্য এবং কেন সৃষ্টি করা হয়েছে?

পশু-পাখী জন্মগ্রহণ করে, খাওয়া-দাওয়া করে, পেশাব-পায়খানা করে তার পর এক সময় মরে যায়। মানুষ কি শুধু পশুর মত খাবে আর মরে যাবে? 'দুনিয়াটা

মস্ত বড়, খাও দাও ফুর্তি কর'- আর মরে যাও- এটাই কি মানুষের দুনিয়ায় আগমনের উদ্দেশ্য? যারা এটাই মনে করে আর এভাবেই মরে যায় কোন চিন্তা করে না- আল্লাহর কুরআন তাদেরকে পশু বলে আখ্যায়িত করেছে। শুধু তাই নয় বরং পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট বলে আখ্যায়িত করেছে।

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

তাদেরকে অন্তর দিয়েছি, কিন্তু তা দিয়ে তারা কোন চিন্তা করে না, তাদেরকে চোখ দিয়েছি কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না, তাদেরকে কান দিয়েছি কিন্তু তা দিয়ে তারা শোনে না, তারা পশুর মত, বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট এবং তারাই গাফেল। (আল আরাফ-১৭৯)

কেন এলাম এ দুনিয়ায়

আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য। আমরাও নামাজে প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার মধ্যে বার বার বলি إِيَّاكَ نَعْبُدُ

"আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি।"

আসলে ইবাদত কি এ শব্দটাই ভাল করে বুঝা দরকার।

আরবী عبد শব্দটির মানে দাস বা চাকর। আব্দ যা করে তাই ইবাদত। দাস যা করে তাই দাসত্ব এবং চাকর যা করে তাই চাকুরী। মানুষ আল্লাহর দাস। আল্লাহ হলেন মুনিব মানুষ হল দাস। মুনিবের কাজ হুকুম দেয়া, দাসের কাজ সে হুকুম পালন করা। সে হুকুম পাঁচ ওয়াক্ত সিজদা করা হতে পারে, সে হুকুম সুদ বন্ধ করা হতে পারে। সে হুকুম একমাস দিনের বেলা না খেয়ে থাকা হতে পারে। সে হুকুম যেনা ও চুরি বন্ধ করাও হতে পারে। তাহলে বুঝা গেল, আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী কাজ করার নামই ইবাদত। আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী নামাজ পড়া যেমন ইবাদত, আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রী মিলনও ইবাদত, আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী বিচার কাজ, রাষ্ট্রীয় কাজ পরিচালনাও ইবাদত।

আল্লাহর হুকুম পালনের নামই ইবাদত। নামাজ পড়া যেমন ইবাদত, নামাজ না পড়াটাও ইবাদত যখন তা পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। রোযা রাখাটাও ইবাদত আবার যখন রাখতে নিষেধ করা হয়েছে তখন রোজা না রাখাটাই ইবাদত।

যেমন সূর্য উঠা এবং ডোবার সময় নামাজ না পড়া ইবাদত। তাহলে নামাজ রোজা নিজে নিজেই ইবাদত নয়, বরং আল্লাহর হুকুম পালন করাটাই ইবাদত। একটু গুছিয়ে বললে বলতে হয় ঃ

"Each and every activity of our life can be 'Ibadat' if it is done in accordance to the order of Allah and of His Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Sallam."

আমাদের জীবনের প্রতিটি কাজই ইবাদত হতে পারবে যদি তা আল্লাহ ও তার রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হুকুম মত করা হয়। যেহেতু আল্লাহ বলেছেন-

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা তিনি নিষেধ করেন তা থেকে দূরে থাক'- (হাশর-৭) অর্থাৎ রাসূলের আদেশ ও নিষেধ উভয় মেনে চলা আল্লাহর হুকুম।

এবাদতের প্রকারভেদ

এবাদত দুই প্রকার ঃ আল্লাহর এবাদত ও শয়তানের এবাদত। আল্লাহর এবাদত করার জন্য যেমন কুরআন হুকুম দিয়েছে, তেমনি শয়তানের এবাদত না করারও হুকুম দিয়েছে। সূরা ইয়াসীনের ৬০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ

তোমরা শয়তানের এবাদত করবে না। কোন ব্যক্তি হয় আল্লাহর এবাদত করবে না হয় শয়তানের এবাদত করবে। যে আল্লাহর এবাদত করে না, ধরে নিতে হবে সে শয়তানের এবাদত করে। মজার ব্যাপার হল শয়তানের এবাদত করতে কোন বেগ পেতে হয় না। আল্লাহর এবাদত না করলেই শয়তানের এবাদত হয়ে যায়। সিঁড়িতে উঠা কষ্ট কিন্তু সিঁড়ি থেকে নামা সহজ।

ইসলাম একমাত্র জীবন বিধান

আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে তার হুকুম আহকাম নবী রাসূলগণের মাধ্যমে মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন। আল্লাহর প্রেরিত এ হুকুমনামার নাম আল-ইসলাম। আল্লাহর কাছে মনোনীত একমাত্র জীবন বিধানের নাম ইসলাম। দুনিয়াতে যত

মতবাদ আছে সবগুলোই মানুষের মন মস্তিষ্কের তৈরী মতবাদ। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন মতবাদ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। দু'টি বিন্দু থেকে কেবলমাত্র একটিই সরল রেখা টানা যায়। অন্য যে কোন রেখা টানাই হোক সেটা হবে বক্র রেখা। আল্লাহ ও তার বান্দাদের মধ্যে একটি মাত্র সোজা সরল পথ আছে সেটিই ইসলাম। যে সোজা সরল পথে চলার জন্য সকল সময় আমরা নামাজের মধ্যে বলে থাকি

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

"আমাদেরকে সরল সোজা পথে পরিচালিত কর।" এটিই ইসলামের পথ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের পথ। আল্লাহতায়ালা তার মনোনয়ন দিয়ে বলেছেন-

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত জীবন বিধান হল ইসলাম। (আলে ইমরান-১৯)

পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান

মানুষের জীবন শান্তি শৃঙ্খলার মধ্যে পরিচালনার জন্য কিছু নিয়ম কানুন, আইন, বিধান দরকার। যে সব নিয়ম কানুন বা বিধান মেনে চললে জীবন ভালভাবে পরিচালনা করা যায় তাকে জীবন বিধান বলে। সোজা কথায় জীবন যাপন করার জন্য যে বিধান তাকেই জীবন বিধান বা Code of life বলা হয়। যে বিধান জীবনের সকল দিক পরিচালনা করতে পারে না, বিশেষ কোন দিক পরিচালনা করতে পারে তাকে অপূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বলা হয়। আর যে বিধান জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সমাধান দিতে পারে, পরিচালনা করতে পারে তাকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বলা হয়। ইসলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত এমনি এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান যা মানুষের জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সমাধান দিতে সক্ষম। অতীতে এ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান সমাজ-রাষ্ট্রে কায়েম হয়েছিল। মানুষের জীবনে এনে দিয়েছিল সুখ ও শান্তি।

মানুষের কোন অঙ্গ না থাকলে তাকে অপূর্ণাঙ্গ মানুষ বলে। ঐ মানুষ দ্বারা সকল কাজ কর্ম করা যায় না। তেমনি অপূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান দিয়ে সকল কাজের সমাধান পাওয়া যায় না। আল্লাহ ইসলামকে যে পূর্ণাঙ্গ দীন হিসেবে পাঠিয়েছেন তা ঘোষণা কুরআন মাজিদেই পাওয়া যায় ঃ

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

তোমাদের জন্য আজ তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের জন্য আমার নেয়ামতকে পূর্ণ করে দিলাম আর ইসলামকে জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করায় তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলাম। (মায়েদা-৩)

কুরআন হাদিস পর্যালোচনা করে দেখা গেছে জীবনের এমন কোন দিক বা বিভাগ নেই যা কুরআন হাদিসে নেই। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তার সমাধান সেখানে পাওয়া যায়। ইসলামে মানুষের জীবনের সমস্যা সমাধানের সকল দিক আলোচনা করা হয়েছে এবং তা অদ্যাবধি বর্তমান আছে। মহান আল্লাহ্ নিজ দায়িত্বে তার প্রেরিত আল কোরআনকে হেফাজত করে রেখেছেন। আল্লাহ্ তায়ালা আল কুরআনকে পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের ফেতনা (বিকৃতি) থেকে রক্ষা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

আমি এই কুরআন নাযিল করেছি আর একে আমি হেফাজত করে রেখেছি। (হিজর ঃ ৯)

মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবন আল্লাহ্ প্রদত্ত এ অবিকৃত জীবন বিধান দ্বারা পরিচালিত হলেই শান্তি ও কল্যাণ পাওয়া সম্ভব। অন্যথায় শান্তি মিলবে না ও কল্যাণ আসবে না। শান্তি ও কল্যাণের স্বার্থেই সকল মানুষকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান অনুসরণ করতে হবে। তাই ইসলামের মত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানকে বাদ দিয়ে যখনই অন্য কোন বিধান অনুসরণ করা হয় তখন তা বাতিল বলে গণ্য হয়। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন বিধান তালাশ করবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। (আলে-ইমরান ঃ ৮৫)

ইসলাম এর ভিত্তি ঃ

ইসলামের ভিত্তি হল لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (হুকুম কর্তা) নেই হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল। এর মূল কথা হল আল্লাহই আমার একমাত্র ইলাহ বা হুকুম কর্তা। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহর হুকুম মেনে

চলতে হবে। দ্বিতীয় অংশের মূল কথা হল শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ, একমাত্র আদর্শ নেতা। অন্য কোন নেতাই আমার জন্য আদর্শ নয়। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর নেতৃত্বই আমাকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে মেনে নিতে হবে। নামাজ রোজা হজ্জ যাকাত আল্লাহর হুকুম মত আদায় করব কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য, শিক্ষা, রাষ্ট্র ইত্যাদি আল্লাহর হুকুম মত চালাব না- এটা হতে পারে না। আল্লাহকে হুকুমকর্তা বলে যখন ঘোষণা দিয়েছি তখন জীবনের সকল ক্ষেত্রে তার হুকুম মেনে চলব এবং অন্যকে তার হুকুম অনুযায়ী চালানোর চেষ্টা করব। অনুরূপভাবে রাসূল (সঃ) এর নামাজ রোজা পোশাক পরিচ্ছদগুলো গ্রহণ করব কিন্তু তার জিহাদ ও রাষ্ট্র পরিচালনার দিকটি গ্রহণ করব না- এমনটি হতে পারে না। আল্লাহর রাসূল (সঃ) কে যখন একমাত্র আদর্শ নেতা মেনে নিয়েছি তখন জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাকে মেনে নিতে হবে। তিনি যে কাজ যেভাবে করেছেন, আমাকেও সেই কাজ সেই ভাবে করতে হবে। তাঁকে অনুসরণ করতে গিয়ে সুবিধাগুলো মানব আর অসুবিধা ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলো মানব না এমন নীতি মুসলমানের হতে পারে না।

I can never reach my goal until and unless I follow the footprints of Prophet Muhammad (SM).

"আমি আমার গন্তব্যস্থলে কখনও পৌঁছাতে পারব না যতক্ষণ পর্যন্ত এবং যে পর্যন্ত না প্রতিটি কাজে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদাংক অনুসরণ করব।"

ইসলাম এর মানদণ্ড

বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) আমাদের জীবন পরিচালনার মানদণ্ড ঘোষণা করে দিয়েছেন-

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِي

আমি তোমাদের কাছে রেখে গেলাম হুকুমনামার দু'টি কিতাব, যতদিন তোমরা তা শক্তভাবে অনুসরণ করবে কেউ তোমাদের পথভ্রষ্ট করতে পারবে না- তার একটি হল আল্লাহর কিতাব আলকুরআন আর একটি হল আমার সুন্নাহ।

হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর কাছ থেকে ইসলাম নিতে হবে। তিনি যা করেছেন যা দিয়েছেন তার সবটুকু গ্রহণ করতে হবে। মুহাম্মাদ (সঃ) এর ইসলামই সত্যিকার মানদণ্ড।

কেউ যদি ইসলামী জীবন বিধান অনুযায়ী তার পুরো জীবন চালাতে চায় তাহলে তাকে কুরআন ও হাদিসের মানদণ্ডেই চলতে হবে। কোন কাজ করব, কোন কাজ করব না, কোন পদ্ধতি গ্রহণ করব অথবা করব না, গ্রহণ করার অথবা বর্জন করার জন্যই প্রতিটি কাজে আমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে এ ব্যাপারে আল্লাহ তাঁর কিতাব কুরআনে কি বলেন, রাসূল (সঃ) তাঁর হাদিসে কি বলেন। তাহলেই সে ইসলামী মানদণ্ড অনুযায়ী জীবন যাপন করতে পারবে। যদি কেউ কুরআন হাদীসের চেয়ে কোন ব্যক্তিকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে তার পথে রওয়ানা দেয় তবে সে তার জীবনকে পূর্ণভাবে ইসলামী মানদণ্ডে পরিচালনা করতে পারবে না। শিরক ও বিদআতে ক্ষত বিক্ষত হবে তার জীবনধারা।

প্রচলিত ধারণা ও সঠিক ধারণা

বহু বছর ধরে ইসলামী জীবন বিধান অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত না হওয়ায় বেশ কিছু ভুল ধারণা আমাদেরকে গ্রাস করে ফেলেছে। কিছু মৌলিক বিষয়ের ধারণা এখানে উল্লেখ করা হল–

১. আল্লাহ

প্রচলিত ঃ আল্লাহকে শুধু মাত্র উপাস্য মনে করা।

সঠিক ঃ আল্লাহকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র ইলাহ (হুকুমকর্তা) মনে করতে হবে, তার হুকুম অনুযায়ী জীবনের সকল কাজ করতে হবে। তার হুকুমের বাইরে অথবা হুকুম বিরোধী কোন কাজ করা যাবে না।

২. রাসূল

প্রচলিত ঃ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে শুধু ধর্মীয় নেতা মনে করা।

সঠিক ঃ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আদর্শ নেতা মেনে নিতে হবে। তার আদর্শের বিরোধী জীবনে কখনো কোন কাজ করা যাবে না।

৩. দ্বীন

প্রচলিত ঃ ইসলামকে একটি ধর্ম মনে করা, ব্যক্তিগত ব্যাপার মনে করা।

সঠিক ঃ ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে মেনে নিতে হবে। শুধু ব্যক্তিগত ব্যাপারে নয়। সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল জায়গায় ইসলামের বিধি বিধান কার্যকর করতে হবে। দ্বীনের অংশ বিশেষের খেদমত নয়, দ্বীনকে পূর্ণভাবে কায়েম করতে হবে।

৪. কুরআন

প্রচলিত ঃ কুরআনকে শুধুমাত্র ধর্মীয় কিতাব মনে করা।

সঠিক ঃ কুরআন মানব জীবনের জন্য এক পূর্ণাঙ্গ বিধান (Complete code of life)। কুরআন শুধু ধর্মীয় বিধানই নয়, এটা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য পূর্ণাঙ্গ বিধানে ভরপুর।

৫. মুত্তাকী

প্রচলিত ঃ শুধু নামাজ রোজা, পোশাক ও চেহারা সুরাত ইসলামী হওয়া।

সঠিক ঃ শুধু নামাজ রোজা ও চেহারা সুরাত নয় বরং তার ব্যক্তিগত, আর্থিক, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন ইসলামী আইন দ্বারা পরিচালিত হলেই তাকে মুত্তাকী বলা যাবে। আল্লাহর আইন লংঘন যাতে না হয় এমন ভাবে জীবন যাপনকারী সতর্ক ব্যক্তিকে মুত্তাকী বলা হয়।

৬. দ্বীনদারী ও দুনিয়াদারী

প্রচলিত ঃ নামাজ রোজাকে দ্বীনদারী কাজ এবং বিবাহ, সমাজ ও রাষ্ট্র চালানোকে দুনিয়াদারী কাজ মনে করা।

সঠিক ঃ ইসলামে সকল কাজই দ্বীনদারী হবে যদি তা আল্লাহ ও রাসূলের বিধি-বিধান মোতাবেক পরিচালিত হয়। কুরআন হাদিস মোতাবেক সংসার, সমাজ, রাষ্ট্র চালানো কাজও ইবাদত হবে- দ্বীনদারীতে পরিণত হবে।

৭. জামায়াতবদ্ধ হওয়া

প্রচলিত ঃ নামাজ, রোজা ও হজ্জ পালন এবং যাকাত আদায় করলেই চলে, জামায়াত টামায়াত দরকার নেই, দল-টল; পার্টি-পুর্টি করা পছন্দ না করা।

সঠিক ঃ জামায়াত বিহীন জিন্দেগী জাহেলিয়াতের জিন্দেগী। জামায়াত ছেড়ে একাকী রওয়ানা হওয়া জাহান্নামের দিকে রওয়ানা হওয়া। জামায়াতবদ্ধভাবে আল্লাহর আইন চালু করতে হবে।

৮. জিহাদ

প্রচলিত ঃ এখন আর জিহাদ নেই। মুসলমান সবাই, কার সাথে জিহাদ করবো, ঝগড়া বিবাদ মারামারি পছন্দ না করা।

সঠিক ঃ জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত ফরজ। দ্বীন কায়েমের জন্য মাল ও জান দিয়ে চেষ্টা চালানো ফরজ কাজ। জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচা, গুনাহ্ মাফ পাওয়া জান্নাতে যাবার উপায় হচ্ছে ঈমানের সাথে সাথে আল্লাহর আইন চালু করার জন্য মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করা।

৯. ভোট-নির্বাচন

প্রচলিত- যাকে ইচ্ছা এবং যে টাকা দিবে তাকে ভোট দেয়া।

সঠিক- যারা সরকার গঠন করে নামাজ কায়েম করবে, যাকাত চালু করবে, ভাল কাজ চালু করবে, মন্দ কাজ বন্ধ করবে তাদেরকে সরকার গঠনের জন্য ভোট দেয়া ফরজ।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

"নিশ্চয় আল্লাহ্ হুকুম করেন তোমাদের আমানত হকদারের নিকট পৌছে দাও।" (নিসা- ৫৮)

১০. আল্লাহর রং এ রঙ্গীন হওয়া

প্রচলিত- এখনও চুল দাড়ি পাকেনি, সময় হোক তখন আখেরাতের প্রস্তুতি নিব- আল্লাহর পথে চলব।

সঠিক- দশ বছর বয়স হতেই আল্লাহর আইন মানা ফরজ হয়ে যায়। যৌবন কালের ইবাদতই আল্লাহর পছন্দনীয়। জ্ঞান বুদ্ধি শুরু থেকে জ্ঞান বুদ্ধি শেষ না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম আল্লাহর পথে টিকে থাকতে হবে। যুবক তার যৌবন ইবাদতে কাটালেই তাকে আরশের ছায়ায় স্থান দেয়া হবে।

ইসলাম একটি প্রাসাদের মত

ইসলামের পাঁচটি খুঁটি-কালেমা, নামাজ, হজ্জ ও যাকাত। কোন একটি ঘর নির্মাণ করতে হলে প্রথমেই খুঁটি বা পিলার লাগাতে হয়। খুঁটি বা পিলার ছাড়া কোন প্রাসাদ নির্মাণ করা যায় না। আবার শুধু খুঁটি বা পিলার লাগিয়েই যদি মনে করা হয় যে ঘর তৈরী হয়ে গেছে তাহলে মস্ত বড় ভুল হয়ে যাবে। ঘরের জন্য ইট লাগবে যা দিয়ে প্রাচীর করতে হবে। প্রাচীর বা দেয়াল ছাড়া ঘরে বাস করা যায় না। শুধু প্রাচীর ও খুঁটি হলেই চলে না, ঘরের ছাদ বা চাল তৈরী করতে হয়। প্রাচীর ও ছাদ বাদ দিয়ে ঘরের কল্পনা করা যায় না। আবার দেয়াল বা চাল যদি না থাকে তাহলে রোদ বৃষ্টি বাতাসের কারণে ঘরে বাস করা যায় না। সেই ঘর বাসের যোগ্য হবে না। তাই আল্লাহর বিধান মোতাবেক ইসলামের প্রাসাদ

নির্মাণ করতে হবে। নবী রাসূলগণ ও সাহাবায়ে কেরাম পর্যন্ত ইসলামের ছাদ নির্মাণ করার জন্য তাদের মূল্যবান জীবনগুলোকে ইটের মত মাটির নিচে চলে যেতে, কাউকে পাথরের খোয়া ও সুরকীর মত জিহাদের মাঠে জীবন দিতে হয়েছিল। এভাবেই ইসলাম কায়েম হয়েছে।

কুরআন পাঁচ পাতার কিতাব নয়

৬৬৬৬টি আয়াত সমন্বয়ে ৫৪০টি রুকু ও ১১৪টি সূরা নিয়ে মহাগ্রন্থ আল কুরআন। কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত শুধু এ কয়েকটি হুকুম নিয়েই যদি কুরআন মাজিদ হত তাহলে কুরআন মাজিদ কয়েকপাতার হলেই চলত। পাঁচটি হুকুমের জন্য বড় জোর পাঁচ-দশ পাতা ওয়ালা কুরআন মাজিদ হলেই চলত। কিন্তু কুরআন মাজিদ তা নয়। একজন কুরআন বিশারদ বলেছেন কুরআন মাজিদে কমপক্ষে এক হাজার হ্যাঁ বোধক হুকুমের আয়াত আছে এবং কমপক্ষে এক হাজার না বোধক (নিষেধের) আয়াত আছে। একজন মুসলমানকে সবগুলো আয়াতের উপর ঈমান আনতে হবে। সমাজে কুরআনের পূর্ণাঙ্গ হুকুম চালু করার চেষ্টা করতে হবে। হাদিস অনুসারে কুরআন মাজিদে পাঁচ প্রকারের আয়াত আছে। (১) হুকুম সংক্রান্ত (২) রূপক আয়াত (মুতাসাবেহাত) (৩) হালাল সংক্রান্ত (৪) হারাম সংক্রান্ত (৫) উদাহরণ সংক্রান্ত।

আইন দুই প্রকার

দুই প্রকার আইন দ্বারা মানুষ চলে। একটি আইন হল আল্লাহর পাঠানো আইন বা নির্ভুল আইন। আল্লাহর যেহেতু কোন ভুল নেই তাই আল্লাহর আইনের মধ্যেও কোন ভুল নেই। মানব ইতিহাসের যে অধ্যায় এই আইন দ্বারা সমাজ রাষ্ট্র চলেছিল সেই অধ্যায়েই অবিশ্বাস্য শান্তি কায়েম হয়েছিল। নবী রাসূল ও খলিফাদের সমাজ এর উদাহরণ। আর যখনই মানুষ এ নির্ভুল আল্লাহর আইন থেকে দূরে সরে গিয়েছে তখনই অশান্তির আগুনে মানুষের সমাজ জীবন জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়েছে।

আর একটি আইন মানুষের তৈরী করা আইন যা অজ্ঞতার আইন। মানুষ যেহেতু ভুলের মধ্যে, মানুষের যেহেতু ভুল হয়, তাই স্বাভাবিকভাবেই তার তৈরী করা আইন ভুল হবে। আর ভুল আইন দিয়ে সমাজ চালালে সমাজে শান্তির আশা করা যায় না। মানুষের আইনে পরিচালিত সমাজে হত্যা, ধর্ষণ, সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি চলতে থাকবে। এ সবের আগুনে সমাজ জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে।

একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, কুরআন সুন্নাহ অনুসারে রচিত মানুষের আইন এবং যা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী নয় এমন আইনও ইসলামী আইনের অন্তর্ভুক্ত হবে।

নবী রাসূলের কাজ

আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে নবী রাসূল পাঠিয়েছেন মানুষকে তার পথে পরিচালনার জন্য। সর্বপ্রথম নবী হযরত আদম (আঃ) এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী দুনিয়াতে আসলেন সাথে জীবন বিধান নিয়ে। মানুষ দুনিয়াতে যত পুরাতন আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানও তত পুরাতন। দুনিয়াতে এমন কোন সময় ছিল না যখন আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান বর্তমান ছিল না। হযরত আদম (আঃ)কে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"তোমরা যাও, সেখানে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে জীবন বিধান আসবে, যারা আমার দেয়া জীবন বিধান মেনে চলবে তাদের কোন ভয় নেই, তারা অনুশোচনা করবে না।" (বাকারা-৩৮)

এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীর মধ্যে প্রায় সকলকেই আল্লাহর জীবন বিধান কায়েম করতে গিয়ে সংঘর্ষ করতে হয়েছে। শুধু হযরত আদম (আঃ) অন্য লোক না থাকায় এবং হযরত সোলায়মান (আঃ) আল্লাহর ইচ্ছায় পৈত্রিকভাবে রাজত্ব লাভ করায় এ দু'জনকে সংঘাত করতে হয়নি। বাকী সকল নবীকে সংঘাত করতে হয়েছে।

আল্লাহর আইন উপরে (বিজয়ী) থাকবে

বর্তমানে আমাদের দেশে আল্লাহর আইন বিজয়ী নেই। বরং মানুষের আইনের নীচে পরাজিত অবস্থায় পড়ে আছে। আল্লাহ তায়ালা মানুষের আইনকে (কুফরী কালেমা) নীচে রাখতে ও আল্লাহর আইনকে (আল্লাহর কালেমা) উপরে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

তিনি কাফেরের কালেমাকে নীচে রাখেন এবং আল্লাহর কালেমাকে উপরে (বিজয়ী) রাখেন। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী বিজ্ঞানময় (তাওবা-৪০)।

আল্লাহর আইনের হক হল বিজয়ী অবস্থায় থাকা। আর মানুষের আইনের হক হল নীচে থাকা। আল্লাহর কালেমা কখনও কুফরী কালেমার নীচে থাকার জন্য দুনিয়ায় আসে নি। একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। আল্লাহ বলেন সুদ হারাম, এটা দেশে চলবে না। এটাকে বন্ধ করতে হবে। মানুষ তার কুফরী কালেমায় বললো সুদ অপরিহার্য, সুদ দিতেই হবে, না দিলে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। তা'হলে বর্তমানে আল্লাহর কালেমা (সুদ চলবে না) বিজয়ী নেই, কুফরী কালেমা (সুদ চলবে) বিজয়ী আছে। আমাদের এখন কাজ হবে কুফরী কালেমাকে ধরে নিচে নামানো আর আল্লাহর কালেমাকে টেনে উপরে উঠানো। মুসলমান বেঁচে থাকবে আর আল্লাহর কালেমা নীচে পরাজিত হয়ে থাকবে- এটা কখনই হতে পারে না। হয় আমরা থাকব আল্লাহর আইন বিজয়ী থাকবে- নয়, আল্লাহর আইন বিজয়ী থাকবে না তো আমরাও থাকব না (শহীদ হয়ে যাবো) এটাই একজন ঈমানদার এর কথা।

আল্লাহর আইন সকলের জন্য

দুনিয়াতে যত মানুষ আছে পুরুষ মহিলা সকলের জন্যই আল্লাহর আইন মেনে চলা জরুরী। যে সব মানুষ অন্যান্য আইন, দর্শন বা ধর্ম মেনে চলে তাদের শান্তির জন্যও ইসলামী আইন প্রয়োজন। অর্থাৎ আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব, তিনি জানেন কিসে মানুষের কল্যাণ আর কিসে মানুষের অকল্যাণ। তাই তিনি মানুষকে সৃষ্টি করে মানুষের মঙ্গলের জন্যই তার আইন পাঠিয়েছেন। মানুষ যেহেতু মানুষকে সৃষ্টি করেনি, তাই মানুষের পক্ষে মানুষের জন্য ভাল আইন রচনা করা সম্ভব নয়। সৃষ্টি যার আইন চলবে তার। সবই আল্লাহর সৃষ্টি, অতএব সবই তার আইন মেনে চলতে বাধ্য।

হযরত আদম (আঃ) হতে শুরু করে যত নবী ও রাসূল এসেছেন সবাই ঐ আল্লাহর আইন মেনে চলার দাওয়াত দিয়ে গেছেন–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ	আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (হুকুমকর্তা) নেই।
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ	হুকুম দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ।
أَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا اللهَ	আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম মানবে না। এ সব হুকুম

আল্লাহর কেতাবের মাধ্যমেই এসেছে। বিশ্ব মানবতা হয় আল্লাহর আইনে চলবে নয় অশান্তির মধ্যে জীবন যাপন করবে।

রাসূল পাঠানোর উদ্দেশ্য

আল্লাহ বলেছেন-

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

তিনিই তো তার রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন যেন উহাকে সমস্ত দ্বীনের (মতবাদের) উপর বিজয়ী করতে পারেন, যদিও মুশরিকগণ এ কাজকে অপছন্দ করে। (সূরা সফ ঃ ৯)

তাহলে কুরআন বলছে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এসেছিলেন দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য। তেইশ বছরের সংগ্রামের মাধ্যমে তিনি দ্বীনকে বিজয়ী করে গেছেন। দ্বীন বিজয়ী করে যে কাজ তিনি করেছেন ঃ

১. মানুষকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের দাওয়াত দিয়েছেন।
২. তাদেরকে নিয়ে তিনি সংগঠন (জামায়াত) করেছেন। লোক তৈরী করেছেন, জনমত সংগ্রহ করেছেন।
৩. কুরআন মাজিদের আয়াত দিয়ে তাদের সংশোধন করেছেন।
৪. মাল খরচ করেছেন, মাল সংগ্রহ করেছেন দ্বীন বিজয়ের জন্য।
৫. হিজরত (আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ থেকে পছন্দনীয় কাজের দিকে প্রত্যাবর্তন) করেছেন।
৬. লড়াই, সংঘর্ষ করেছেন- প্রায় ১৯টি যুদ্ধ নিজে পরিচালনা করেছেন।
৭. ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছেন- রাষ্ট্র প্রধান সরকার প্রধান হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন।
৮. নামাজ কায়েম করে জনগণের চরিত্র সংশোধন করেছেন।
৯. যাকাত চালু করে মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান সহ মৌলিক চাহিদা পূরণ করেছেন।
১০. ভাল কাজ সমাজে চালু করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন।
১১. মন্দ কাজগুলো চিরতরে বন্ধ করে পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করেছেন। সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, হত্যা, ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস ইত্যাদি মন্দ কাজগুলোর জন্য শাস্তির আইন জারী করে অপরাধের রাস্তা বন্ধ করেছেন।

১২. দুনিয়ার সুখ সুবিধার চেয়েও আখেরাতের সুখ সুবিধাকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন।
১৩. শিরক, বিদয়াত ও কুসংস্কারকে খতম করেছেন।
১৪. সংশোধনের জন্য তওবা, অপরাধ-মার্জনার দরজা খুলে রাখার সংবাদ দিয়েছেন।
১৫. পরামর্শ ভিত্তিক কাজ করেছেন।

রাষ্ট্রশক্তি ছাড়া আইন চালু হয় না

যে কোন আইন চালু করার জন্য রাষ্ট্রশক্তি অপরিহার্য। ইসলামী আইন চালু করার জন্যও রাষ্ট্রশক্তি দরকার। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদে দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন ঃ

وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا

'হে আল্লাহ! তোমার পক্ষ থেকে আমাকে একটি সাহায্যকারী রাষ্ট্রশক্তি দাও'। (ইসরা- ৮০)

রাষ্ট্রশক্তি দিয়েই কুরআনের আইন চালু করতে হবে। সূরা হাদীদের আয়াতাংশ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ (এবং আমরা লৌহ নাজিল করেছি) দ্বারা এ দিকেরই ইংগিত দেয়া হয়েছে। ইসলামী জীবন বিধান চালু করার জন্য তিনটি উপাদান লাগবে। (১) লোক তৈরী করা (২) জনমত তৈরী করা ও (৩) আল্লাহর সাহায্য পাওয়া। এ তিনটি বিষয় পূর্ণ হলে ইসলামী রাষ্ট্র আশা করা যায়।

জামায়াত বদ্ধ চেষ্টা করা ফরজ

ইসলামী জীবন বিধান চালু করার জন্য জামায়াত বদ্ধভাবে চেষ্টা করার হুকুম কুরআন ও হাদিসে স্পষ্ট ভাষায় পাওয়া যায়।

তোমরা আল্লাহর আইনকে জামায়াত বদ্ধভাবে ধর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না'।

হাদিসে এসেছে (১) যে জামায়াত বিহীন মৃত্যু বরণ করে সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করে। (২) তিন জন লোক জংগলে থাকলেও একজনকে আমীর বানিয়ে নিতে হবে। (৩) যে একাকী জামায়াত ছেড়ে রওয়ানা দিল সে জাহান্নামের পথে রওয়ানা দিল। (৪) পাল ছাড়া ছাগলকে যেমন বাঘ খেয়ে ফেলে জামায়াত ছেড়ে চলে যাওয়া ব্যক্তিকেও শয়তান ধ্বংস করে ছাড়ে। (৫) আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিচ্ছি যা আল্লাহ আমাকে নির্দেশ

দিয়েছেন জামায়াত ভুক্ত থাকা, কথা শুনা, কথা মানা, হিজরত করা ও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ চালানো (৬)

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ-

(مشكوة)

যে ব্যক্তি মারা গেল কিন্তু জিহাদ করল না, অথবা জিহাদ করার চিন্তাও তার মনের মধ্যে আসল না সে মুনাফেকীর উপর মৃত্যুবরণ করল। –আল হাদীস

জিহাদই মুক্তির পথ

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহকেই বাংলায় ইসলামী আন্দোলন বলা হয়। এই জিহাদই একমাত্র মুক্তির পথ। কুরআন মাজিদে সূরা সফে আল্লাহ তায়ালা প্রকৃত মুক্তির পথের কথা বলেছেন। আল্লাহর পথে জিহাদ করলে মৌলিক লাভ পাওয়া যাবে ঃ

১. জাহান্নামের দাউ দাউ করা আগুন থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

২. জীবনের গুনাহ মাফ পাওয়া যাবে।

৩. জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে।

৪. মানুষ নগদ প্রাপ্তি হিসেবে যেটা ভালবাসে আল্লাহর সাহায্য পেলে সেই বিজয় পাওয়া যাবে। উপরোক্ত চারটি ফল পাওয়া যাবে যদি দু'টি কাজ করে ঃ

ক. আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি মজবুত ঈমান আনে।

খ. নিজের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে লড়াই করে অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূলের দেয়া যে আইন সেই আইন চালু করার জন্য টাকা দিয়ে রক্ত দিয়ে সংগ্রাম করে।

উল্লেখ্য যে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর মালিক, গুনাহ মাফ করার মালিক, জান্নাতে প্রবেশ করানোর মালিক ও সাহায্যের মাধ্যমে বিজয় দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ। আর সেই আল্লাহই বলে দিচ্ছেন এই কাজ করলে এই ফল পাওয়া যাবে। অতএব যিনি দেবার মালিক তিনি যদি রাস্তা বলে দেন তবে সেই রাস্তায় চলার ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। বিন্দু পরিমাণ সন্দেহ থাকতে পারে না।

মাল দিয়ে সংগ্রাম করা

আল্লাহর আইন চালু করার জন্য প্রথমে মাল দিয়ে সংগ্রাম করতে বলেছেন–

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ

তোমরা জিহাদ করো আল্লাহর পথে তোমাদের মাল ও জান দিয়ে। (তাওবা- ৪১)

অনেকে 'জিহাদ করো জান ও মাল দিয়ে' বলে থাকেন। আগে যারা জান দেয়ার কথা বলেন তাদের মনে রাখতে হবে প্রথমেই জান দিয়ে দিলে মাল খরচ করার সুযোগও পাওয়া যাবে না। তাই আগে মাল ও পরে জান দিয়ে লড়াই করার কথা বলা হয়েছে।

হাদিসে তিন ধরনের টাকা খরচ করাকে উত্তম বলা হয়েছে ঃ

ক. মুজাহিদের জন্য টাকা খরচ করা।

খ. জিহাদের উপায় উপকরণ ও যানবাহনের জন্য খরচ করা।

গ. মুজাহিদের পরিবারের জন্য খরচ করা।

উল্লেখ্য যে, পরিবারের জন্য টাকা খরচ করার উপদেশ দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না। নিজে নিজেই এ কাজ করে যায়। যে কাজের জন্য উপদেশ ও লোকমা দেয়া দরকার হয় সেটি হল মুজাহিদের জন্য ও তাদের উপায় উপকরণ কিনার জন্য। হাদিসে এসেছে যিনি জিহাদ করবেন ও সেই সাথে জিহাদের জন্য নিজ মাল খরচ করবেন তিনি দশ লক্ষ গুণ সওয়াব পাবেন।

টের পাওয়ার মত খরচ করুন

আল্লাহর পথে কুরবানী করতে হবে জান ও মালের। মাল এমন ভাবে খরচ করতে হবে যেন তা কুরবানী মনে হয়। কুরবানী মানে কষ্ট পাওয়া, গায়ে একটু আচড় লাগানো। এমন পরিমাণ টাকা আল্লাহর পথে দিতে হবে যাতে একটু টের পাওয়া যায়। একটা বস্ত্রহীন ভিক্ষুককে সচ্ছল ব্যক্তি পকেট থেকে দু-পাঁচ টাকা দিলে তা দান হতে পারে, প্রকৃত অর্থে কুরবানী হতে পারে না। যদি বস্ত্রহীন ঐ ফকিরকে কোন কাপড়ের দোকান থেকে একটা লুংগী ও একটি জামা কিনে দেয়া হয় তাহলে তা কুরবানী হবে। কারণ তখন ফকিরও টের পাবে কিছু পেলাম আর দাতাও টের পাবে কিছু দিলাম, এটাই কুরবানী।

তাই ইসলামী আন্দোলনের সাথে যারা জড়িত তারা আয়ের ৫% ভাগ থেকে ১০% ভাগ প্রতিমাসে আল্লাহর পথে ব্যয় করেন ও অন্যাকে ব্যয় করতে উদ্বুদ্ধ করে থাকেন। আসুন আখেরাতে নাজাতের আশায় আমরা সম্পদ হতে ৫% হতে ১০% আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার কাজে খরচ করি।

দ্বীনী কাজে ভারসাম্য রক্ষা করুন

বাড়ীর প্রয়োজনে বাজার করতে হয়। বাজার করার সময় যাতে প্রয়োজনীয় জিনিস বাদ পড়ে না যায় তাই বাজারের তালিকা তৈরী করতে হয়। যারা

বুদ্ধিমান তারা তালিকা তৈরী করে পরিবারের সকল প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে নিয়ে আসেন। সকলের সন্তুষ্টি অর্জন করে থাকেন। আর যারা বাজারের তালিকা না করে যতটুকু মনে থাকে ততটুকু বাজার করে আনেন তারা বাড়ীর সদস্যদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারেন না। বরং পরিবারে বাজার করে এনেও আইটেম ছুটে যাবার জন্য তাদেরকে বকুনি শুনতে হয়।

এ জন্যই ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ফরজ ওয়াজিব কাজগুলো ব্যক্তিগত রিপোর্ট সংরক্ষণের মাধ্যমে নিয়মিত আদায়ে সহযোগিতা পেয়ে থাকেন। যারা রিপোর্ট রেখে কাজ করেন তাদের কুরআন অধ্যয়ন, হাদিস অধ্যয়ন, ইসলামী সাহিত্য, জামায়াতে নামাজ, দাওয়াতী কাজ, সাংগঠনিক কাজ সবই ঠিকমত হয়। তারা ভারসাম্য রক্ষা করে কাজ করেন। কিন্তু যারা রিপোর্ট রাখেন না তাদের কুরআন পড়া হলে হাদিস পড়া হয় না, হাদিস পড়া হলে দাওয়াতী কাজ হয় না এমনি ভাবে ভারসাম্য বিহীন কাজ করে থাকেন। তাই ভারসাম্য রক্ষা করে কাজ করার লক্ষ্যে ব্যক্তিগত রিপোর্ট সংরক্ষণ জরুরী।

সাপ্তাহিক ভাবে জামায়াতবদ্ধ কাজ করুন

সাপ্তাহিক বৈঠক চালু করে দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ করুন। দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যবস্থা বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় পাওয়া যায় না। তাই সাপ্তাহিক বৈঠকে দারসে কুরআন, দারসে হাদিস, ইসলামী আলোচনা ও পরস্পরের সহযোগিতা করে দ্বীনী কাজে এগিয়ে যেতে হবে। সাহাবীগণ সপ্তাহে একটি দিন দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণের জন্য বসতেন। বৃহস্পতিবার দিনই তারা বসতেন। কেউ কেউ সপ্তাহে একাধিকবার বসার জজবাও রাখতেন। কিন্তু নিয়ম মাফিক চলার জন্য তারা সাপ্তাহিক বৈঠকই চালু রেখেছিলেন।

দাওয়াতী কাজ

বাড়ী বাড়ী গিয়ে আলাদাভাবে দাওয়াতী কাজ করা খুবই উপকারী। দাওয়াতী কাজ করলে পাঁচটি উপকার হয়ঃ

১. জ্ঞানের চর্চা হয় ও জ্ঞান বৃদ্ধি পায়,
২. জ্ঞান মোতাবেক কাজ করার সুযোগ হয়,
৩. বিনা পয়সায় নিজেকে সংশোধন করা যায়,
৪. দুনিয়ার সবচেয়ে উত্তম কাজে শরীক হওয়া যায়,
৫. সাদকায়ে জারীয়ার কাজ হয়ে যায়,

দাওয়াত দানকারীর মর্যাদা প্রসংগে নিম্নোক্ত হাদিসটিতে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

"যে ব্যক্তি কাউকে কল্যাণের দিকে দাওয়াত দিল সে দাওয়াত প্রাপ্ত ব্যক্তির নেক আমলের সমপরিমাণ নেকী পাবে।" মৃত্যুর পর দাওয়াত দান কারীর নিজের আমল বন্ধ হয়ে গেলেও দাওয়াতী কাজের নেকী বন্ধ হবে না। উদাহরণ স্বরূপ তিনি কুরআনের একজন নতুন পাঠক তৈরী করে গেলেন। পাঠক যতদিন কুরআন পড়বেন ততদিন তার সমপরিমাণ নেকী তিনি পেতে থাকবেন। আবার কোন ব্যক্তিকে তিনি আল্লাহর পথে খরচ (ইয়ানত দিতে) করতে উদ্বুদ্ধ করে গেলেন। ঐ ব্যক্তি যতদিন দান করতে থাকবেন ততদিন তার সমপরিমাণ নেকী তিনি পেতে থাকবেন। দাওয়াত প্রাপ্ত ব্যক্তি যাদেরকে এসব দাওয়াত দিবেন তাদের আমলের নেকীর অংশ প্রথম ব্যক্তি পেতে থাকবেন। এভাবে তিনি মৃত্যুর পরও অনেক ব্যক্তিকে সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে রেখে যান, ফলে তার নেকী বহুগুণে বাড়তে থাকে। এজন্যই রাসূল (সঃ) দাওয়াতী কাজ সম্পর্কে বলেছেন আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম। (বুখারী)

ইসলামী আন্দোলনে নবী রাসূলগণের উদাহরণ

এক. হযরত নুহ (আঃ) যখন তার কওমকে আল্লাহর দিকে ডেকেছিলেন তখন তারা যে সব প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন তা সূরা নুহ ৫-৯ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল-

১. আল্লাহর আইন মেনে চলার আহ্বান জানালে তাকে বেশী করে এড়িয়ে চলেছে।
২. তাদের মাগফেরাতের জন্য কথা বললে তারা কানে আংগুল ঢুকিয়েছে।
৩. চেহারা যাতে দেখতে না পায় তার জন্য তারা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকেছে।
৪. তারা খুবই জেদ ও অহংকার করেছে।
৫. এরপরও হযরত নুহ (আঃ) তাদেরকে উচ্চস্বরে, প্রকাশ্যে ও গোপনে চুপিসারে দিনে ও রাতে দাওয়াত দিয়েছিলেন প্রায় ৯৫০ বছর ধরে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে নুহ (আঃ)কে তার কওম এত প্রহার করত যে তিনি মারের চোটে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তেন। এরপর তারা তাকে একটি কম্বলে জড়িয়ে গৃহে রেখে যেত। তারা

মনে করত তিনি মরে গেছেন। পরের দিন যখন তার চেতনা ফিরে আসত আবার তিনি তার কওমকে দাওয়াত দিতেন।

মহাপ্লাবনে আল্লাহর আইন অস্বীকারকারী পুত্র কেনান যখন পানিতে ভেসে যাচ্ছিল তখন তার পুত্রকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করলে আল্লাহ পরিষ্কার জবাব দিয়ে দিলেন- إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ

সে তোমার পরিবারের কেউ নয়- (এ যেন দেহের একটি পচা মাংশপিণ্ড যা শরীর থেকে অপারেশন করে ফেলে দিলেই শরীরটা বেঁচে যায়)। (হুদ- ৪৬)

দুই. হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর আপন পিতাকে আল্লাহর অবাধ্য শয়তানের গোলামী না করে আল্লাহর গোলামী করার আহ্বান জানালে পিতা বলল, 'হে ইবরাহীম তুমি কি আমার মাবুদদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? যদি তুমি বিরত না হও আমি অবশ্যই পাথরের আঘাতে তোমার জীবন শেষ করে দিব। তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও।" (মরিয়ম- ৪৬)

বাদশাহ নমরূদ আল্লাহর আইন চালু করার আন্দোলন করার অপরাধে হযরত ইবরাহীমকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করেছিল। আর আল্লাহ তায়ালা আগুনকে Air Conditioned করে দিলেন এই বলে-

يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ

হে আগুন ইবরাহীমের জন্য তুমি শান্তি ও আরামদায়ক হয়ে যাও। (আম্বিয়া- ৬৯)

আল্লাহর আইন মানার ক্ষেত্রে হযরত ইবরাহীম (আঃ) আপোষহীন ছিলেন। নিজ পুত্রকে জবাই করার হুকুমও তিনি পালন করেন। তার কাছে পুত্র বড় ছিল না, আল্লাহর হুকুমটাই ছিল সবচেয়ে বড়। ছেলে ইসমাইল (আঃ)ও আল্লাহর হুকুমকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিলেন। মা হাজেরাও ছেলেকে জবাই করার জন্য পাঠাতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করলেন। এদের সকলের কাছেই আল্লাহর আইন সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আজকের সমাজে ইসলামী আন্দোলনকে সফল করার জন্য-

১. হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর মত কিছু পিতা দরকার,

২. হযরত ইসমাইল (আঃ) এর মত কিছু সন্তান দরকার,

৩. বিবি হাজেরার মত কিছু মা দরকার।

তিন. হযরত মুসা (আঃ) দাওয়াত দিলেন ফেরাউনকে আল্লাহর আইন মানার। ফেরাউন ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠল ঃ

ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ

ছেড়ে দাও আমাকে, আমি মুসা (আঃ)কে হত্যা করে ফেলি- (মুমিন- ২৬)

ফেরাউন তার সেনাবাহিনী নিয়ে মুসা (আঃ)কে হত্যা করার জন্য নীলনদে পশ্চাদ্ধাবন করতে গেল। অবশেষে তার দলবল সহ নীল নদে ডুবে মরল। যুগে যুগে এটাই হয়েছে- যারাই ইসলামী আন্দোলনের মুজাহিদদের ধ্বংস করতে গেছে- পরিণামে তারা নিজেরাই ধ্বংস হয়ে গেছে। এখনও এ ইতিহাস জারী আছে।

চার. হযরত মুহাম্মদ (সঃ)কে অবর্ণনীয় ও অসহনীয় নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। "আর স্মরণ কর যখন কাফেররা ষড়যন্ত্র করছিল তোমাকে হত্যা করবে, অথবা বন্দী করবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেবে- (আনফাল- ৩০)

তাকে যে সব অত্যাচার করেছিল–

১. হযরত (সঃ)-এর পবিত্র মুখে তারা ধুলাবালি ছিটিয়ে ছিল।
২. তার পবিত্র মুখে থুথু নিক্ষেপ পর্যন্ত করেছিল।
৩. সামনা সামনি অপমানজনক গালি দিয়েছিল।
৪. রুকু ও সিজদায় থাকাকালীন উটের পচা দুর্গন্ধযুক্ত নাড়ীভুড়ি চাপিয়েছিল।
৫. প্রতিবেশীরা তাদের বাড়ীর নোংরা ময়লা তার বাড়িতে নিক্ষেপ করেছিল।
৬. তার যাতায়াতের পথে তারা তীক্ষ্ণ কাঁটা বিছিয়ে দিয়েছিল।
৭. কাবায় তওয়াফ করার সময় তার গলায় গামছা বাধিয়ে ছিল।
৮. তাকে হত্যা করার জন্য শত উটের পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। কিন্তু কোন কিছুই তাকে আন্দোলনের পথ থেকে সরাতে পারেনি। অর্থ ও স্বর্ণের পাহাড়, নারী ও ক্ষমতার লোভ কোন কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি বলেছিলেন "আমার এক হাতে যদি সূর্য এনে দাও আর এক হাতে চাঁদ এনে দাও তবুও আমি এ আন্দোলন থেকে বিরত হব না। হয় এতে বিজয়ী হব, নয় শহীদ হব।"

মক্কার শ্রেষ্ঠ ধনাঢ্য মহিলা হযরত খাদিজা (রাঃ) কে বিয়ে করে তিনি সম্পদের মালিকও হয়েছিলেন। কিন্তু সকল ধনসম্পদ দ্বীনী আন্দোলনে ব্যয় করে দেন। এমনকি তায়েফে দাওয়াত দেয়ার জন্য একটি নিজস্ব উটও ছিল না যাতে চড়ে

তায়েফ যাওয়া যায়। তায়েফবাসীরা এমনভাবে তাকে মারে যে তার শরীরের রক্ত দু'পায়ের জুতায় সিমেন্টের মত লেগে যায়। ওহুদের যুদ্ধে তার একটি দাঁত ভেংগে মুখমণ্ডল রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়।

ইসলামী আন্দোলনে সাহাবীদের উদাহরণ

প্রায় লক্ষাধিক সাহাবী ইসলামী আন্দোলনে তাদের জান মালকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। এ কারণেই রাসূল (সঃ) বলেছিলেন- خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِيْ

আমার জেনারেশনই (Generation) শ্রেষ্ঠ জেনারেশন।

রাসূল (সঃ) বলেছেন যে ব্যক্তি দুধ দোহনের সমপরিমাণ সময় আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।

একবার এক ব্যক্তির জানাযা পড়ার সময় ওমর (রাঃ) বললেন সে গোনাহগার। রাসূল (সঃ) যখন লোকদের মাধ্যমে জানতে পারলেন যে সে জিহাদে এক রাত পাহারা দিয়েছে তখন তিনি তার জানাযা পড়ে বললেন লোকটি জান্নাতি।

এক. আশারায়ে মুবাশ্শারাহ্ (চার খলিফা, তালহা, জুবায়ের, আবদুর রহমান ইবনে আওফ, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, সাঈদ ইবনে যায়িদ, আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাজিআল্লাহু তা'য়ালা আনহুম আজমায়ীন) যাদেরকে দুনিয়ায় জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল তারা সকলেই মাল ও জানের কুরবানীর ব্যাপারে অগ্রগামী ছিলেন।

সাঈদ ইবনে যায়ীদকে, দামেস্কের গভর্নর নিয়োগ করা হলে তিনি বললেন "আপনারা জিহাদ করবেন আর আমি বঞ্চিত থাকব তা হয় না"। তিনি গভর্নর পদ বাদ দিয়ে জেহাদে শরীক হলেন।

দুই. নববিবাহিত আনসারী সাহাবী হযরত হানজালা (রাঃ) ডাক শুনে আলিঙ্গন রতা স্ত্রীকে সরিয়ে ওহুদের ময়দানে লড়াই করে শহীদ হন।

ফেরেশতা এসে তার ফরজ গোসল করিয়ে দেয়। এ জন্যই তাকে গাসীলুল মালায়েকা বলা হয়।

তিন. আম্মার (রাঃ), তার মা সুমাইয়া (রাঃ), তার পিতা ইয়াসীর (রাঃ) ইসলামের একেবারে প্রথম অবস্থায় অকথ্য নির্যাতনের শিকার হন। নির্যাতিত আম্মার পরিবারকে রাসূল (সঃ) বলতেন, 'জান্নাত তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।' ইসলামী আন্দোলনে প্রেরণার জ্বলন্ত উৎস এ পরিবারটি।

চার. আমর ইবনে জামুহ (রাঃ) এক পা খোড়া হওয়া সত্বেও জিহাদে যাবার অনুমতি নিলেন এবং বললেন আমি যদি শহীদ হই তবে খোড়াতে খোড়াতে জান্নাতে যাব। তার স্ত্রী ও ছেলেরা বাধা দিলে রসূল (সঃ) বললেন তাকে বাধা দিও না সম্ভবতঃ তার ভাগ্যে শাহাদাতের মর্যাদা লিখা আছে'। জিহাদে যাবার সময় আমর (রাঃ) দোয়া করেছিলেন "হে আল্লাহ আমাকে আমার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে এনো না"। যুদ্ধে শহীদ হবার পর তার লাশ বহনকারী উট মদীনার দিকে মুখ করালে বসে পড়ে কিন্তু উহুদের দিকে রওয়ানা দেয়। রাসূল (সঃ) আমরের স্ত্রীর কাছে দোয়ার কথা জানতে পেরে তার লাশ ওহুদের মাঠেই দাফন করে দেন।

পাঁচ. মুসআব ইবনে উমায়ের (রাঃ) ছোট বেলায় তার পিতার অগাধ সম্পত্তির মাঝে সচ্ছলভাবে লালিত পালিত হন। সব সময় সাজগোজ করে নতুন নতুন পোশাক পরতেন। চরিত্র তার ভাল ছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর দাওয়াত কবুল করে হাবসায় গিয়ে দায়ী ইলাল্লাহর কাজ করেন। পরে মদিনার বড় বড় সরদারগণ তার দাওয়াতে দ্বীন কবুল করেন। ওহুদের যুদ্ধে তার ডান হাত কাটা পড়লে বাম হাতে তার ঝাণ্ডা তুলে ধরে। এক কালের নতুন নতুন পোশাকে লালিত সন্তান দাফনের সময় মাত্র একটি চাদর পান। তা দিয়ে যখন মাথা ঢাকা হয় তখন পা বের হয়ে যায়- আবার পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যায়। রাসূল (সঃ) বললেন মাথা চাদর দিয়ে ঢেকে পা ইজখির ঘাস দিয়ে এই শহীদকে মাটি দিয়ে দাও।

ছয়. হযরত আনাস ইবনে নযর (রাঃ) ওহুদের যুদ্ধে রাসূল (সঃ) এর শাহাদাতের খবর ছড়িয়ে পড়লে তিনি তরবারী হাতে যুদ্ধের দিকে ছুটে চলেন। রাস্তায় বললেন, "আল্লাহর কসম আমি ওহুদের দিক থেকে জান্নাতের খোশবু পাচ্ছি।" এ বলেই কাফেরদের মধ্যে ঢুকে পড়েন ও যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হন। আঘাতে আঘাতে তার শরীর জর্জরিত হয়ে চেনা যাচ্ছিল না। তার বোন হাতের আঙ্গুল দেখে চিনতে পারেন। দাফনের সময় তার শরীরে তরবারী, তীর ও বর্শার সর্বমোট ৮০টি আঘাত ছিল।

সাত. সা'দ ইবনে রবী (রাঃ) তার মুহাজির ভাই আবদুর রহমান ইবনে আওফকে (রাঃ) তার সমস্ত সম্পদের অর্ধেক সম্পদ দেয়ার ঘোষণা দেন এবং তার দু'জন স্ত্রীর যাকে তার পছন্দ হবে তাকে তালাক দিয়ে ইদ্দত শেষে বিয়ে দিয়ে দিবেন। ইসলামী আন্দোলনের পথে নিবেদিত মুহাজির ভাইদের প্রতি কি মহান ত্যাগের নমুনা।

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) তার সম্পদ দানের ঘোষণায় শুকরিয়া জানায়ে বললেন "আল্লাহ আপনার মাল ও পরিবার পরিজনে বরকত দান করুন। আমার ওসবের প্রয়োজন হবে না- দয়া করে আমাকে বাজারের পথটি দেখিয়ে দিন।

আট. কাব ইবনে মালিক (রাঃ) তাবুক যুদ্ধে যেতে না পারায় তাকে কারণ জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি সত্য কথা বললেন এবং কোন ওজর দেখালেন না। তাকে বয়কট করা হল। এ খবর জানতে পেরে গাসসানের বাদশাহ তাকে চিঠি লিখল। "শুনলাম তোমার নেতা তোমার কোন কদর করছে না, তুমি আমার এখানে আস তোমাকে একটা ভাল পদ দিয়ে দিব।"- পদলোভ দেখিয়ে এমন চিঠি ইসলামের দুশমন আমাকে লেখতে পারল'- এ বলে তিনি গাসসানের সে চিঠি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেললেন।

মহিলা সাহাবীর উদাহরণ

নয়. মহিলা সাহাবী- হযরত সুমাইয়া (রাঃ) ইসলামী আন্দোলনের মহিলাদের জন্য একটি মাইল ফলক। জীবনের সব হারিয়েছেন। কিন্তু কালেমায়ে তাওহীদ হারান নি। কাফের কোরেশদের অত্যাচার জুলুম নির্যাতন নিষ্পেষণের শিকার এত মর্মান্তিক ভাবে আর কেউ হয়েছেন কি না জানা নেই। কাফের সর্দার আবু জেহেল তার গুপ্ত স্থানে বল্লম নিক্ষেপ করে তাকে নির্মম ভাবে আঘাত হানে। এই বল্লমের আঘাতে তিনি শহীদ হন। মহিলাদের মধ্যে সর্ব প্রথম তিনিই শহীদ হন।

দশ. ওহুদ যুদ্ধে রাসূল (সঃ) এর শাহাদাতের খবর ছড়িয়ে পড়লে আমর বিন জামুহ (রাঃ) এর স্ত্রী হিন্দ (রাঃ) রাসূলকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে পড়েন। যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার সময় লোকেরা তাকে বলল, তোমার স্বামী তোমার ছেলে তোমার ভাই শহীদ হয়েছেন। সকলের ক্ষেত্রেই ইন্নালিল্লাহ পড়ে ধৈর্য ধারণ করেন। প্রতিবারই জিজ্ঞেস করেন রাসূল (সঃ) এর খবর কি? যখন জানলেন রাসূল (সঃ) জীবিত আছেন তখনই তিনি সান্ত্বনা পেলেন ও আল হামদুলিল্লাহ পড়লেন। ইসলামী আন্দোলনের একজন মহিলার কাছে তার স্বামী, ছেলে, ভাই হারানোর বেদনার চেয়ে রাসূল (সঃ) এর হারানোর বেদনা অনেক বেশী। রাসূল (সঃ) এর হাদিস এক্ষেত্রে স্মরণীয় "তোমাদের কেউ প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ নিজের পিতামাতা সন্তান সন্ততি ও সমগ্র মানবজাতির চেয়েও আমাকে ভাল না বাসবে।"

উপরের কয়েকজন সাহাবী ছাড়াও অসংখ্য সাহাবী তাদের মাল ও জান কুরবান করে কাফেরদের অত্যাচার সহ্য করেছেন। হযরত বিলাল (রাঃ) কে বালুর উপরে পাথর চাপা দিয়ে মেরে ফেলতে চাইলেও তার মুখ থেকে তাওহীদের ঘোষণা 'আহাদ' 'আহাদ' বন্ধ করতে পারে নি। হযরত খাব্বাব (রাঃ) কে জ্বলন্ত আগুনের অঙ্গারের উপর শুইয়ে পাথর চাপা দেয়। শরীরের চর্বি গলে শরীর গর্ত হয়ে যাবার পর আগুন নিভে যায়। বহুদিন যাবত তার পিঠে ছোট ছোট গর্ত ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) এর ক্রীতদাসী হযরত লুবাইনা (রাঃ) ওমরের মার খেয়েছেন- ইসলাম ছাড়েন নি। রাসূল (সঃ) একটি হাদিসে বলেছেন, তোমাদের আগে যারা ইসলামী আন্দোলন করেছিল তাদের কাউকে মাটিতে অর্ধেক পুতে লোহার করাত দিয়ে দ্বি-খণ্ডিত করা হয়েছিল, কাউকে লোহার চিরুনী দিয়ে তার শরীরের গোশত চেঁচে ফেলে দিয়েছিল- তবুও তারা ইসলামী আন্দোলন থেকে এক বিন্দু সরে যায় নাই। সবর কর দ্বীন বিজয় লাভ করবে এবং পরিবেশ এমন হবে যে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত চলে যাবে সেখানে কোন ভয় থাকবে না।

আত্মীয়তা বড় নয় আদর্শই বড়

আল্লাহ কুরআন মাজিদে বলেন–

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ
وَلَوْ كَانُوا اٰبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيرَتَهُمْ

আল্লাহ্ ও আখেরাতে ঈমানদার এমন কাউকে তুমি পাবে না যে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের বিরোধীতাকারীকে ভালবাসে হোক না কেন তারা তাদের বাপ, তাদের পুত্র, তাদের ভাই বা তাদের আত্মীয়। (মুজাদালা- ২২)

ইসলামী আন্দোলনের অতীত ইতিহাস অত্যন্ত উজ্জ্বল ও স্পষ্ট। জিহাদের ময়দানে মুজাহিদদের কাছে আদর্শই ছিল সবচেয়ে বড়। রক্ত সম্পর্ক বা আত্মীয়তার সম্পর্ক বড় ছিল না। বদর ও উহুদ যুদ্ধে এর নমুনা পাওয়া যায়।

১. হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) বদরের যুদ্ধে অত্যন্ত বীর বিক্রমে অবতীর্ণ হন। তার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনুল জাররাহ কাফেরদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করতে এসেছিল। তার সন্তানকে হত্যা করার জন্য তীর ছুঁড়তে লাগল। কিছু সময়

আবু ওবায়দা (রাঃ) আত্মরক্ষা করে চললেন। শেষ পর্যন্ত ঈমানের জোস পিতা-পুত্রের সম্পর্কের উপর প্রভাব বিস্তার করল এবং প্রথম আক্রমণে পিতার জীবনাবসান ঘটালেন। দ্বীনের প্রতি নির্মল প্রেম ও নিঃস্বার্থ জেহাদেরই এটা জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

২. প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) কে তার সন্তান বলেছিল আব্বা আপনাকে যুদ্ধে পেয়েছিলাম কিন্তু পিতার খাতিরে আক্রমণ করিনি। হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, আমি যদি তোকে পেতাম তাহলে মোটেও খাতির করতাম না।

৩. খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) বদরের যুদ্ধে নিজের কাকের মামা আশ ইবনে হিসামকে হত্যা করতে পিছপা হন নি। তিনি বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে নবী (সঃ) এর নিকট দাবী করেছিলেন এদের সকলকেই হত্যা করতে হবে এবং প্রত্যেককেই তার নিকটাত্মীয় হত্যা করবে। আদর্শের ব্যাপারে এ বক্তব্য ছিল বলিষ্ঠ বক্তব্য।

৪. বদর যুদ্ধে মুসআব ইবনে উমাইর (রাঃ) তার আপন ভাই উবায়েদ ইবনে উমাইরকেও খাতির করেন নি। আবুল আস ছিল নবী (সঃ) এর আপন জামাতা। তাকেও বন্দী হিসেবে ভিন্নতর কোন ব্যবহার করা হয়নি। স্বজনপ্রীতির কোন প্রশ্নই এখানে আসে না। এভাবে দুনিয়াবাসীকে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে নিষ্ঠাবান ঈমানদার মুসলমান কাকে বলে এবং কি রকম হয়ে থাকে।

আল্লাহ তায়ালা এদের সম্পর্কেই উল্লেখ করেছেন, "এরাই আল্লাহর দল (হিযবুল্লাহ) এবং এরাই প্রকৃতপক্ষে মুক্তিপ্রাপ্ত।"

এ ঘটনাগুলো থেকে আমাদের চিন্তা করা উচিত। আমরা যারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমানের দাবী করছি- তারা কিভাবে ইসলামের দুষমনদের সমর্থন দিয়ে থাকি? নামাজী ও রোজাদার ব্যক্তি আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার সমর্থন না দিয়ে ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ বা ইসলাম কায়েম করবে না-এমন মতবাদকে কিভাবে সমর্থন করতে পারে? উপরের আয়াত অনুযায়ী ইসলাম ছাড়া অন্য কোন বিরোধী মতবাদ সমর্থন করা সম্পূর্ণভাবে হারাম।

ইসলামী আন্দোলনের সৈনিকদের আকীদা

১. তারা বিশ্বাস করে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মৃত্যু আসবে না।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ

"আর আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না।" (আলে ইমরান- ১৪৫)

২. তারা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। কারণ তারা বিশ্বাস করে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন মসীবত আসতে পারে না।

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ

"আল্লাহর নির্দেশ ব্যতিরেকে কোন বিপদ আসেনা।" (তাগাবুন- ১১)

৩. আল্লাহর কাছে তারা সরাসরি চায় কোন মাধ্যম বা দালাল তালাশ করে না।

أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

"যখন কেউ আমাকে ডাকে তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিই"। (বাকারা- ১৮৬)

৪. আল্লাহ ছাড়া অ-আল্লাহর (গায়রুল্লাহর) দিকে তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। তাবিজ তুমার গ্রহণ করে তাওহীদ থেকে দূরে সরে না। হাদিসে আছে ঃ

مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ

"যে ব্যক্তি তাবিজ কবজ বাধল সে শিরক করল।" (আহমাদ) অন্য হাদিসে আছে, 'যে ব্যক্তি কোন তাবিজ ঝুলাবে আল্লাহ তাতে কোন ফায়দা দিবেন না। আর যে কোন কবজ ঝুলাবে আল্লাহ তার বিপদ কখনও দূর করবেন না'।

৫. তারা বিশ্বাস করে

১. ইসলাম রাজনীতি মুক্ত হতে পারে না। যেহেতু ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলাম থেকে রাজনীতি বাদ দেয়া একটি বিদআত।

২. অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড ঘটানো ও তার মধ্যে দীনের উন্নতি খোঁজ করা বিদআত।

৩. মাথা নত করে সম্মান দেখানো এবং পা ছুয়ে কদমবুসী করা বিদআত।

৪. পুরুষ প্রধান ইসলামী সমাজই তাদের কাম্য।

৫. শরিয়তের সীমা লংঘনকারী পোশাক, অহংকার সৃষ্টিকারী অপচয়মূলক পোশাক বিদআত।

৬. স্বপ্নের ফায়সালা মেনে নিয়ে কাজ করা বিদআত।*

ইসলামী আন্দোলন শিরক ও বিদআত উচ্ছেদ করে রাসূল (সঃ)এর দেখিয়ে দেয়া ইসলাম কায়েম করার একটি সর্বাত্মক আন্দোলন।*

শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা- একটি উদাহরণ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন- "আমার ইচ্ছা হয় আমি শহীদ হই, আবার জীবিত হই আবার শহীদ হই, আবার জীবিত হই আবার শহীদ হই।" (বুখারী)

তাবুক অভিযানে শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষী এক সাহাবী আব্দুল্লাহ জুল বাজাদাইন রাসূল (সঃ) এর কাছে এসে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার জন্য দোয়া করুন আমি যেন জিহাদে শহীদ হয়ে যাই।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) গাছের ছাল তার হাতে বেধে দিয়ে বললেন, 'ইয়া আল্লাহ! আব্দুল্লাহর খুন কাফেরদের জন্য হারাম করে দাও।' তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল আমি শহীদ হতে চাই, আর আপনি কি দোয়া করলেন?'

রাসূল (সঃ) বললেন, তোমার মৃত্যু যদি জ্বর হয়েও হয় তবুও তুমি হাকীকী শহীদ।

তাবুকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) মাস খানেক ছিলেন। এর মধ্যেই খবর এল আব্দুল্লাহ জুল বাজাদাইন ইন্তেকাল করেছেন। রাতে লাশ দাফনের জন্য আলোর মশাল জ্বালানো হল। জানাজা পড়ে রাসূল (সঃ) নিজে তার কবরে নামলেন। যখন হযরত আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) লাশ ধরে কবরে নামাচ্ছিলেন তখন রাসূল (সঃ) বললেন (أدبا اخاكما) 'তোমাদের ভায়ের লাশ আদবের সাথে নামাও। রাসূল (সঃ) লাশ কবরে রেখে বের হয়ে আসলেন এবং বললেন তোমরা কবরের পাশ থেকে সরে দাঁড়াও। সাহাবাগণ সরে দাঁড়ালেন। রাসূল (সঃ) নিজ হাতে কবরের উপর বালু পাথর চাপা দিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ! আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি আবদুল্লাহর প্রতি রাজী ছিলাম। তুমিও তার প্রতি রাজী হয়ে যাও।'

বর্ণনাকারী হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ বললেন, "কবরে শায়িত ব্যক্তি আব্দুল্লাহ জুল বাজাদাইন না হয়ে যদি আমি আব্দুল্লাহ হতাম।"

---

* বিস্তারিত দেখুন 'সুন্নাত ও বিদায়ত"-মাওলানা আব্দুর রহীম

সকল কাজ আখেরাতের চেতনায় করুন

সব সময় মনে রাখতে হবে আমি আল্লাহকে খুশী করার জন্যই কাজ করছি। দুনিয়ার লাভ বা লোভের কারণে কাজ করা বা লোক দেখানো কাজ করা শিরক। এমন কি নামাজ লোক দেখানোর জন্য আদায় করলেও শিরক। হাদিসে এসেছে–

مَنْ صَلّٰى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ

"যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য নামাজ পড়ল সে শিরক করল"।

হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) আরো বলেছেন কিয়ামতের দিনে সর্বপ্রথম শহীদের বিচার হবে। শহীদ বলবে সে দ্বীনের জন্য শহীদ হয়েছে। সে জান্নাতে যাবার দাবী করবে। কিন্তু আল্লাহ বলবেন তুমি শহীদ হয়েছিলে যুদ্ধ করে, কিন্তু যুদ্ধ করেছিলে তোমার বীরত্ব প্রকাশ করার জন্য। লোকে তোমাকে বীর বলবে সে জন্য। তুমি তা পেয়ে গেছ। শেষ পর্যন্ত তাকে মুখের ভরে হেচড়িয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার হুকুম দিবেন। একজন দাতা ও অন্য একজন বক্তার প্রসঙ্গে একই কথা বলা হয়েছে। তাই খুবই সাবধানে কাজ করতে হবে। যাতে চোরাগলি দিয়ে ঈমানের সাথে রিয়া, গীবত, পরের সমালোচনা ও অহংকার প্রবেশ করতে না পারে। দুনিয়ার অল্প মেয়াদের জীবনে কষ্ট করে হলেও আখেরাতের দীর্ঘ মেয়াদী জীবনের জন্যই কাজ করে যেতে হবে। আল্লাহ তওফীক দিন- আমিন॥

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সমাপ্ত

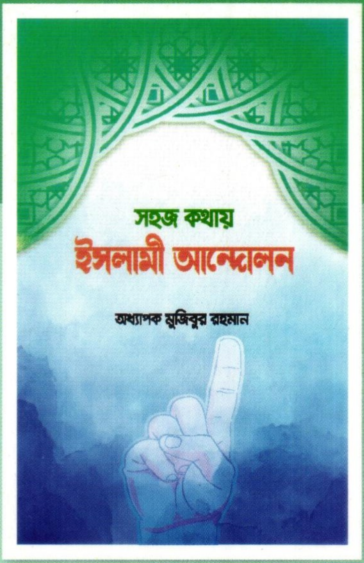

সহজ কথায় ইসলামী
আন্দোলন
অধ্যাপক মুজিবুর ...
255055#1393051-
35
R

বাংলা বই বিশ্বময়..
বিশ্বের যেকোন স্থান থেকে অনলাইন
ও ই-রিডার এ পড়ুন

iBooks Scribd. kobo
Google play nook amazonkindle

আহসান
পাবলিকেশন
www.ahsanpublication.com
/ahsanpublication